بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২০ আগস্ট, ২০২১ মোতাবেক ২০ যহুর, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত উমর (রা.)'র যুগের আলোচনা হচ্ছে, সে সময় যেসব যুদ্ধ করা হয়েছে তার উল্লেখ করা হচ্ছিল সে সবের একটি হলো **'জুন্দায়ে সাবুর'** এর যুদ্ধ। **হযরত আবু সাবরাহ্ বিন রুহম** সাসানীয় (বা ইরানী) জনপদগুলো জয় করার পর সৈন্যদের নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হন আর **জুন্দায়ে সাবুর** এ শিবির স্থাপন করেন। **জুন্দায়ে সাবুর** হলো প্রাচীন খুযিস্তানের একটি শহর। যাহোক, (সেখানে) তাদের অর্থাৎ শত্রুদের সাথে সকাল-সন্ধ্যা যুদ্ধ হতে থাকে, কিন্তু তিনি নিজের জায়গায় অবিচল থাকেন। (এরইমধ্যে) এক পর্যায়ে মুসলমানদের মধ্য হতে কেউ নিরাপত্তা প্রদানের প্রস্তাব দিয়ে বসে। শত্রুরা দুর্গের ভেতরে থাকতো আর সুযোগ বুঝে বাইরে এসে আক্রমণ করতো। (কিন্তু) একজন মুসলমান যখন (নিরাপত্তার) প্রস্তাব দেয়, কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নয়, বরং একজন সাধারণ মুসলমান (প্রস্তাব) দেয়, তখন তারা সঙ্গে সঙ্গে দুর্গের দ্বার খুলে দেয়। গবাদিপশু বাইরে বেরিয়ে আসে, বাজার-হাট খুলে যায়, আর লোকজন যত্রতত্র চোখে পড়ে। মুসলমানরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের কী হয়েছে? তারা (উত্তরে) বলে, আপনারা আমাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছেন আর আমরা তা গ্রহণ করেছি। আমরা কর প্রদান করবো আর আপনারা আমাদের নিরাপত্তা বিধান করবেন। মুসলমানরা বলে, আমরাতো এমনটি করিনি। তারা বলে, আমরা মিথ্যে বলছি না। এরপর মুসলমানরা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করলে জানা যায় যে, **মিকনাফ** নামের একজন ক্রীতদাস একাজ করেছে। এ সম্পর্কে হযরত উমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বস্ততাকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। এই অঙ্গীকার পূর্ণ না করা পর্যন্ত তোমরা বিশ্বস্ত প্রমাণিত হতে পারবে না। যে অঙ্গীকার করা হয়েছে, ক্রীতদাস করলেও তা পূর্ণ করো। যতক্ষণ তোমাদের সন্দেহ থাকবে (ততক্ষণ) তাদেরকে অবকাশ দাও এবং তাদের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করো। অতএব, মুসলমানরা অঙ্গীকারের সত্যায়ন করে এবং (সেখান থেকে) ফিরে আসে। এই যুদ্ধটি খুযিস্তান বিজয়ের ক্ষেত্রে সর্বশেষ যুদ্ধ ছিল।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও এ ধরনের ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, হযরত উমর (রা.)'র যুগে একজন কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস একটি জাতীর সাথে এই চুক্তি বা সন্ধি করেছিল যে, তোমাদেরকে অমুক অমুক ছাড় দেয়া হবে। ইসলামী সৈন্যদল সেখানে গেলে সেই জাতী বলে, আমাদের সাথে তো এই চুক্তি রয়েছে। সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এই চুক্তি মানার ক্ষেত্রে টালবাহানা করে। বিষয়টি হযরত উমর (রা.)'র সমীপে গেলে তিনি (রা.) বলেন, মুসলমানের কথা বা অঙ্গীকার মিথ্যা হওয়া উচিত নয়, তা সে ক্রীতদাসই করুক না কেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.)'র যুগে একটি শত্রুসেনাদল অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে আর তারা বুঝতে পারে যে, তাদের রক্ষা নেই। পূর্বে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এটি তার বিস্তারিত বিবরণ, তিনি (রা.) নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন। ইসলামী সেনাপতি জোরপূর্বক আমাদের দুর্গ দখল করছে, যদি সে দখল করে নেয় তাহলে আমাদের সাথে বিজিত দেশের মত ব্যবহার করা হবে।

প্রত্যেক মুসলমান পরাজিত হওয়া এবং সন্ধি করার মধ্যকার পার্থক্য (কি তা) জানতো। বিজিতদের জন্য তো সাধারণ ইসলামী আইন কার্যকর হতো আর সন্ধির ক্ষেত্রে তারা অর্থাৎ অপর পক্ষ যত শর্তই নিরূপণ করত বা যত বেশি সম্ভব অধিকার মানাতে পারতো মানাতো। তারা ভাবলো, এমন কোন পথ বেছে নেওয়া উচিত যাতে নরম বা সহজ শর্তে সন্ধি হয়ে যায়। অতএব একদিন কৃষ্ণাঙ্গ এক ক্রীতদাস পানি ভরছিল, তার কাছে গিয়ে তারা বললো, হে ভাই! (বলতো) যদি সন্ধি হয়ে যায় তা যুদ্ধের চেয়ে ভালো নয় কি? সে বলে, অবশ্যই ভালো। সেই কৃষ্ণাঙ্গ অশিক্ষিত ছিল। তারা বলে, তাহলে এই শর্তে সন্ধি হলে উত্তম হয় যে, আমরা আমাদের দেশে স্বাধীনভাবে বসবাস করব আর আমাদের কিছুই বলা হবে না। আমাদের ধনসম্পদ আমাদের কাছে থাকবে এবং তোমাদের ধনসম্পদ তোমাদের কাছে থাকবে। সে বলে, একদম ঠিক। (পরক্ষণে) তারা দুর্গের দ্বারগুলো খুলে দেয়। এরপর ইসলামী বাহিনী আসলে তারা অর্থাৎ শত্রুরা বলে, আমাদের সাথে তো তোমাদের সন্ধি হয়ে গেছে। তারা অর্থাৎ মুসলমানরা বলে, সন্ধি কোথায় হলো? আর কোন কর্মকর্তা তা করেছে? তারা বলে, তা আমাদের জানা নেই। আমরা কীভাবে জানবো যে, তোমাদের মধ্যে কে কর্মকর্তা আর কে নয়? এক ব্যক্তি এখানে পানি ভরছিল, তাকে আমরা এই কথা বলেছি আর সে আমাদের উক্ত কথা বলেছে। মুসলমানরা বলে যে, দেখ! এক ক্রীতদাস বের হয়েছিল, তাকে জিজ্ঞেস কর যে, কী হয়েছে। সে বলে যে, হ্যাঁ। অর্থাৎ সেই কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে যে, হ্যাঁ, আমার সাথে কথা হয়েছিল। তখন মুসলমানরা বলে, সে তো এক ক্রীতদাস ছিল, তাকে সিদ্ধান্ত প্রদানের অধিকার কে দিয়েছে? তখন শত্রুরা বলে, আমরা কীকরে বলব যে, সে তোমাদের কর্মকর্তা কি-না। আমরা অপরিচিত আর আমরা ভাবলাম যে, সে-ই তোমাদের জেনারেল অর্থাৎ (তারা) ধূর্ততার আশ্রয় নেয়। তখন সেনাপ্রধান বলেন, আমি তা মানতে পারি না, কিন্তু আমি এই ঘটনা হযরত উমর (রা.)'র কাছে লিখে পাঠাচ্ছি। এই পত্র পেয়ে হযরত উমর (রা.) বলেন, ভবিষ্যতের জন্য এই ঘোষণা করে দাও যে, সেনাপ্রধান ছাড়া অন্য কেউ শান্তিচুক্তি করতে পারবে না। কিন্তু এটি হতে পারে না যে, এক মুসলমান কথা দিবে আর আমি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করব। এখন সেই কৃষ্ণাঙ্গ যে সন্ধি করে ফেলেছে তা তোমাদের মেনে নিতে হবে। তবে হ্যাঁ, ভবিষ্যতের জন্য এই ঘোষণা করে দাও যে, সেনাপ্রধান ছাড়া অন্য কেউ কোন জাতির সাথে সন্ধি করতে পারবে না।

হযরত উমর (রা.)'র ইরান বিজয়ের পেছনে কী কী কারণ ছিল, কেন তিনি বাধ্য হয়েছিলেন– এসব বিষয় এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.)'র আন্তরিক বাসনা ছিল, যদি **ইরাক ও আহওয়ায**-এর যুদ্ধেই এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান ঘটে তাহলে ভালো হয়। যুদ্ধ করে কোন লাভ নেই। শত্রুরা আক্রমণ করছে, শত্রুকে একবার পরাজিত করা হয়েছে, তাদের শক্তিকে পদদলিত করা হয়েছে, এখানেই (সবকিছু) শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। তিনি (রা.) বার বার এই বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন যে, হায়! আমাদের ও ইরানীদের মাঝে যদি এমন কোন প্রতিবন্ধক থাকতো যার ফলে না তারা আমাদের দিকে আসতে পারতো আর না আমরা তাদের দিকে যেতে পারতাম। কিন্তু ইরানী সাম্রাজ্যের অব্যাহত সামরিক তৎপরতা তাঁর এই বাসনা পূর্ণ হতে দেয় নি। ১৭ হিজরী সনে মুসলিম সেনা কর্মকর্তাদের একটি দল হযরত উমর (রা.)'র সমীপে উপস্থিত হয়। হযরত উমর (রা.) সেই দলের সামনে এই প্রশ্ন রাখেন যে, বিজিত অঞ্চলগুলোতে বার বার কেন চুক্তিভঙ্গ ও বিদ্রোহ দেখা দেয়? হযরত উমর (রা.) এই সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, মুসলমানরা (হয়ত) বিজিত অঞ্চলগুলোর অধিবাসীদের জন্য কষ্টের কারণ হচ্ছে। এ কারণেই চুক্তিভঙ্গ হচ্ছে।

দলের সদস্যরা এই বিষয়টি অস্বীকার করেন। তারা বলেন যে, না, বিষয়টি এমন নয় এবং বলেন, আমাদের জানা মতে মুসলমানরা পূর্ণ বিশ্বস্ততা এবং সুশাসন করে থাকে। হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞেস করেন, তাহলে এই গণ্ডগোলের কারণ কী? দলের অন্যান্য সদস্যরা এর কোন গ্রহণযোগ্য উত্তর দিতে পারেন নি, কিন্তু **আহনাফ বিন কায়েস** বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি আপনাকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত করছি। আসল কথা হলো, আপনি আমাদেরকে আর কোন সামরিক অগ্রাভিযান করতে বারণ করেছেন যে, আর যুদ্ধ করবে না এবং যতটা অঞ্চল জয় হয়েছে তাতেই সীমাবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু ইরানের বাদশাহ্ এখনও জীবিত আছে আর তার বর্তমানে ইরানীরা আমাদের সাথে লড়াই অব্যাহত রাখবে। এটি কখনও সম্ভব নয় যে, এক দেশে দুই সরকার থাকবে। যে কোন অবস্থায় একটি অপরটিকে বের করেই ছাড়বে। হয় ইরানীরা থাকবে না হয় আমরা থাকব। তিনি বলেন, আপনি জানেন যে, আমরা কোন একটি এলাকাও জবর দখল করি নি, বরং শত্রুদের আক্রমণ করার ফলে জয় করেছি। আমরা নিজে থেকে তো কখনও যুদ্ধ আরম্ভ করি নি আর এটিই আপনার নির্দেশ ছিল। শত্রুরা আক্রমণ করলে বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করতে হতো আর এরপর সেসব এলাকা জয়ও হতো। যাহোক, মুসলমানদের মধ্য থেকে যারা অকারণে যুদ্ধ করার বৈধতা খুঁজে বেড়ায় তাদের জন্যও বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে এবং ইসলামের ওপর আপত্তিকারীদের জন্যও এতে উত্তর চলে এসেছে যে, মুসলমানরা কখনও ভূমি দখল করার জন্য আর দেশ জয় করার জন্য যুদ্ধ করতো না, বরং তাদের ওপর আক্রমণ হলে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করতো, যার ফলশ্রুতিতে বিজয়ও অর্জিত হতো। যাহোক, তিনি বলেন, সৈন্যবাহিনী তাদের বাদশাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে। আর তাদের এরূপ আচরণ ভবিষ্যতেও ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে যতদিন আপনি আমাদেরকে সামরিক অগ্রাভিযানের এবং সম্রাটকে পারস্য থেকে বিতাড়িত করার অনুমতি না দিবেন। এরূপ হলেই পারস্যবাসীদের পুনরায় বিজয় লাভের আশা ভঙ্গ হতে পারে। আসল বিষয় এটিই ছিল। হযরত উমর (রা.) এই মতামতকে সঠিক আখ্যা দিয়ে এটি উপলব্ধি করেন যে, এখন ইরানে অগ্রাভিযান করা ব্যতীত আর কোন উপায় নেই। এছাড়া অন্য কোন পথ নেই; এটি ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে না, নতুবা মুসলমানদের রক্ত ঝরতে থাকবে আর যুদ্ধ হতে থাকবে। কিন্তু তবুও কার্যত এর সিদ্ধান্ত হযরত উমর (রা.) আরো দেড়-দুই বছর পর ২১ হিজরী সনে **নাহাওয়ান্দের** যুদ্ধের পর করেছেন, যখন ইরানীরা প্রবল শক্তি নিয়ে মুসলমানদের মোকাবিলা করতে বের হয়েছিল আর **নাহাওয়ান্দের** যুদ্ধে তুমুল লড়াই হয়েছিল। **নাহাওয়ান্দের** যুদ্ধকে **ফাতহুল ফুতুহ্**-ও বলা হয়ে থাকে। ইরান এবং ইরাকে মুসলমানদের যুদ্ধাভিযানগুলোর মাঝে তিনটি যুদ্ধ চূড়ান্ত লড়াইয়ের মর্যাদা রাখে, অর্থাৎ, **কাদসিয়ার যুদ্ধ, জলুলার যুদ্ধ এবং নাহাওয়ান্দের যুদ্ধ**। আর নিজ ফলাফলের নিরিখে নাহাওয়ান্দের বিজয় এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, মুসলমানদের মাঝে তা **'ফাতহুল ফুতুহ্'** নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, অর্থাৎ সকল বিজয়ের চেয়ে উত্তম বিজয়। নাহাওয়ান্দের এই যুদ্ধ প্রথম দু'টি বড় পরাজয়ের পর ইরানীদের পক্ষ থেকে এমন আক্রমণের সর্বশেষ চেষ্টা ছিল।

এই যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ হলো, **ইরানের বাদশাহ্ ইয়াযদাজর্‌দ,** যে কিনা তখন **মারভ**-এ অবস্থান করছিল, অথবা **আবু হানিফা দেনাভরির** বর্ণনামতে **কুম**-এ অবস্থান করছিল, অত্যন্ত তৎপরতার সাথে মুসলমানদের মোকাবিলার জন্য সৈন্য একত্রিত করতে আরম্ভ করে আর নিজ পত্রাদির মাধ্যমে খুরাসান থেকে সিন্ধু পর্যন্ত পুরো দেশে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে দেয়। আর সকল দিক থেকে ইরানী সৈন্যরা দলে দলে নাহাওয়ান্দে সমবেত হতে থাকে। নাহাওয়ান্দ হলো, ইরানের

একটি শহর যা **কিরমানশাহের** পূর্বে অবস্থিত এবং **হামাদান** প্রদেশের রাজধানী– হামাদান থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। নাহাওয়ান্দ সম্পূর্ণরূপে পাহাড়ে ঘেরা একটি শহর ছিল। হযরত সা'দ (রা.) এই সৈন্য সমাবেশের সংবাদ হযরত উমর (রা.)'র সমীপে মদীনায় প্রেরণ করেন। কিছুদিন পর যখন হযরত উমর (রা.) স্বয়ং হযরত সা'দ (রা.)-কে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন এবং হযরত সা'দ (রা.) মদীনায় যাওয়ার সুযোগ পান, তখন তিনি এই সমস্ত সংবাদ হযরত উমর (রা.)'র সমীপে মৌখিকভাবে উপস্থাপন করেন। হযরত সা'দ (রা.)-কে অব্যাহতি দিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব খিলাফতের পক্ষ থেকে হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)-কে প্রদান করা হয়। হযরত আম্মার (রা.) ইরানীদের এই সামরিক তৎপরতার যেসব সংবাদ পেতেন সবই মদীনায় প্রেরণ করতে থাকেন। হযরত উমর (রা.) শূরা বা পরামর্শ ডাকেন এবং মিম্বরে দাঁড়িয়ে একটি বক্তৃতা দেন। যাতে তিনি (রা.) বলেন, "হে আরব জাতি! আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের মাধ্যমে তোমাদের সমর্থন করেছেন এবং বিভেদের পর তোমাদের ঐক্যবদ্ধ করেছেন আর অনাহারে থাকতে তিনি তোমাদের সম্পশালী করেছেন। যে ক্ষেত্রেই তোমাদের শত্রুর মোকাবিলা করতে হয়েছে তিনি সেখানে তোমাদের বিজয় দান করেছেন। অতএব, তোমরা না কখনও ক্লান্তশ্রান্ত হয়েছ, আর না পরাজিত হয়েছ। এখন শয়তান আল্লাহ্‌র জ্যোতিকে নিভিয়ে দেয়ার জন্য কিছু সৈন্য একত্রিত করেছে। এটি আম্মার বিন ইয়াসেরের পত্র। **কুমেস, তাবারিস্তান, নিমবাওন্দ, জুরজান, আসফাহান, কুম, হামাদান, মাহেন এবং সাবাযানের** অধিবাসীরা তাদের বাদশাহ্‌র কাছে একত্রিত হচ্ছে **কূফা ও বসরায়** অবস্থানরত তোমাদের ভাইদের মোকাবিলা করার জন্য এবং তাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে স্বয়ং তোমাদের দেশের ওপর আক্রমণ করার জন্য।

অতএব হে লোকেরা! এ বিষয়ে আমাকে পরামর্শ দাও। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি আশা করি তোমরা পরস্পর অধিক কথাবার্তা ও ভিন্ন ভিন্ন মতামত প্রদানে লিপ্ত হবে না। তোমরা আমাকে অল্প বাক্যে পরামর্শ দাও, এই মুহূর্তে আমার ইরান যাত্রা করা এবং বসরা এবং কূফার মাঝে কোন উপযুক্ত স্থানে শিবির স্থাপন করে নিজ সেনাদলকে সাহায্য করা আর আল্লাহ্‌র কৃপায় এই যুদ্ধে যদি বিজয় লাভ হয় তাহলে নিজ সেনাদল শত্রু এলাকায় আরও অগ্রসর হওয়ার জন্য যাত্রা করা কি যৌক্তিক হবে? হযরত উমর (রা.)'র বক্তব্যের পর হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ দাঁড়ান এবং তাশাহ্‌হুদ পাঠের পর বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়াদি আপনাকে বুদ্ধিমান বানিয়ে দিয়েছে এবং অভিজ্ঞতা আপনাকে চৌকস বানিয়ে দিয়েছে, আপনি যা ভালো মনে করেন, তাই করুন এবং আপনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করুন, আমরা আপনার সাথে আছি, আপনি আমাদেরকে আদেশ দিন, আমরা আপনার পূর্ণ আনুগত্য করব, আমাদেরকে ডাকলে আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিব। আমাদেরকে কোথাও প্রেরণ করলে আমরা রওয়ানা হয়ে যাব, আপনি আমাদেরকে সাথে নিয়ে যেতে চাইলে আমরা আপনার সাথে যেতে প্রস্তুত। এখন আপনি নিজেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করুন কেননা, আপনি সব বিষয়ে অবগত আছেন এবং অভীজ্ঞও বটে। তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ এ কথা বলে বসে পড়েন কিন্তু হযরত উমর (রা.) আরও পরামর্শ চাচ্ছিলেন। তিনি (রা.) বলেন, হে লোকেরা! আরো কিছু বলো, কেননা আজকের বিষয়টি এমন যার ফলাফল হবে সুদূর-প্রসারী। তখন হযরত উসমান (রা.) দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার মতে আপনি সিরিয়া এবং ইয়েমেনে এ মর্মে নির্দেশনা প্রেরণ করুন যে, সেখান থেকে ইসলামী সেনাদল যেন ইরানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। একইভাবে বসরার

সেনাবাহিনীকে নির্দেশনা প্রেরণ করুন যেন সেখান থেকেও সেনাদল (ইরানের উদ্দেশ্যে) যাত্রা করে আর আপনি স্বয়ং এখান থেকে হিজাযের সেনাদল নিয়ে কূফা অভিমুখে যাত্রা করুন। এর ফলে আপনার হৃদয়ে শত্রু সেনাদলের সংখ্যাধিক্যের শঙ্কা দূর হয়ে যাবে। এটি এমনই নাজুক পরিস্থিতি যার পরিণতি হবে সুদূর-প্রসারী তাই এ বিষয়ে আপনার নিজের সিদ্ধান্ত এবং বন্ধুদের সাথে আপনার অবস্থান আবশ্যক। অর্থাৎ ফ্রন্ট লাইনে স্বয়ং আপনার যাওয়া উচিত। হযরত উসমান (রা.)'র এই পরামর্শ সভার অধিকাংশ মানুষের মনঃপূত হয় এবং চতুর্দিক থেকে মুসলমানরা বলে, এই প্রস্তাব যথাযথ। হযরত উমর (রা.) আরও পরামর্শ চান কেননা পূর্বোক্ত পরামর্শ হযরত উমর (রা.) গ্রহণ করেন নি তাই তিনি (রা.) বলেন, আরও পরামর্শ দাও। তখন হযরত আলী (রা.) দণ্ডায়মান হন এবং সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন আর বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি যদি সিরিয়ার সেনাদলকে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার নির্দেশ প্রদান করেন তাহলে সেই এলাকা রোমান বাদশাহ্ দখল করে নিবে আর ইয়েমেন থেকে যদি ইসলামী সেনাদল সরিয়ে নেন তাহলে হাবশা বা ইথিওপিয়ার বাদশাহ্ উক্ত এলাকা দখল করে নিবে। আপনি যদি এখান থেকে যাত্রা করেন তাহলে দেশের প্রত্যেক প্রান্ত থেকে আপনার যাত্রার সংবাদ শুনে সবাই আপনার সহযাত্রী হওয়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়বে আর যে সংকট মোকাবিলার জন্য আপনি যাচ্ছেন, এর চেয়ে বড় সংকট দেশ খালি করে যাওয়ার দরুন এখানে সৃষ্টি হবে। অতএব, হযরত আলী (রা.) পরামর্শ দেন যে, বসরায় এই আদেশ দিয়ে প্রেরণ করুন যে, (সেখানকার) মোট সেনাদল তিন ভাগে ভাগ করা হোক। একদল সেনা ইসলামী জনবসতিতে বাড়িঘর এবং এর চতুষ্পার্শ্ব সুরক্ষায় নিয়োজিত থাকবে। এক দল ঐসব বিজিত অঞ্চলে মোতায়েন করা হোক- যাদের সাথে শান্তিচুক্তি হয়েছে যেন যুদ্ধের সময় সেখানকার বাসিন্দারা চুক্তিভঙ্গ করে বিদ্রোহ না করে বসে আর একদল মুসলমানদের জন্য তথা কূফাবাসীর সহায়তায় প্রেরণ করা হোক। এভাবে কূফাবাসীদেরকে লিখে পাঠান যে, সেনাদলের একটি অংশ সেখানেই অবস্থান করুক আর দু'ভাগ শত্রুর সাথে মোকাবিলা করার জন্য যাত্রা করুক। একইভাবে সিরিয়ার সেনাদলকে আদেশ দিন যেন সেনাদলের দু'টি অংশ সিরিয়ায় অবস্থান করে এবং একটি অংশ ইরানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে আর এ ধরণের অধ্যাদেশ আম্মান এবং দেশের অন্যান্য এলাকা এবং শহরগুলোর নামেও জারি করা হোক। রণাঙ্গনে স্বয়ং আপনার যাওয়া সমীচীন হবে না; কারণ আপনার মর্যাদা একটি মতির হারতুল্য। যদি হার খুলে যায় তাহলে মতি বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে এরপর পুনরায় তা কখনও একত্রিত হবে না। এছাড়া যদি ইরানীরা জানতে পারে যে, আরবের শাসক স্বয়ং রণক্ষেত্রে এসেছেন তাহলে তারা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করবে; পুরো প্রস্তুতি নিয়ে লড়াই করার জন্য আসবে। আপনি যে শত্রুর গতিবিধির কথা উল্লেখ করেছেন, স্মরণ রাখবেন খোদা তা'লা আপনার রণপ্রস্তুতি ও গতিবিধির তুলনায় শত্রুর গতিবিধিকে সাংঘাতিক ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেন আর তিনি অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা যা ঘৃণা করেন তা পরিবর্তন করতে (তিনি) প্রবল পরাক্রমশালী। আবার আপনি যে শত্রু শিবিরের সংখ্যাধিক্যের কথা উল্লেখ করেছেন; আমাদের অতীত ইতিহাস বলে, আমাদের লড়াই সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে নয় বরং ঐশী সাহায্যের ওপর আস্থা রেখেই সংঘটিত হত এবং আমাদের জয়-পরাজয় সেনাবাহিনীর সংখ্যাধিক্য কিংবা সংখ্যাস্বল্পতার ভিত্তিতে হতো না। এটি তো খোদার ধর্ম; যাকে খোদা বিজয়ী করেছেন আর এটি খোদার বাহিনী যাকে তিনি সাহায্য করেছেন এবং ফিরিশ্‌তা বাহিনী দিয়ে তাদেরকে সেই সাহায্য করেছেন যার ফলে তারা এই মর্যাদা লাভ করেছে। আমাদের সাথে আছে

ঐশী প্রতিশ্রুতি; আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন এবং নিজ সেনাবাহিনীকে সাহায্য করবেন।

একথা শুনে হযরত উমর (রা.) বলেন– হ্যাঁ; তোমার বক্তব্য সঠিক; যদি আমি নিজে যাত্রা করি তাহলে মুসলমানরা চতুর্দিক থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়বে আর অন্যদিকে ইরানীরা সর্বশক্তি নিয়ে তাদের সঙ্গী-সাথীদের সহযোগিতার জন্য বেরিয়ে পড়বে আর বলবে– আরবের সবচেয়ে বড় শাসক স্বয়ং রণক্ষেত্রে বেরিয়ে এসেছে। যদি আমরা এই যুদ্ধের জন্য বের হই তাহলে প্রকারান্তরে গোটা আরবকে পরাভূত করারই নামান্তর; তাই আমার যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া সমীচীন হবে না; অর্থাৎ শত্রুপক্ষ বলবে, যদি আমরা জয়লাভ করি তবে গোটা আরব আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে; কাজেই আমার যুদ্ধে যাওয়া সমীচীন হবে না। সেনাপ্রধান নির্বাচনের জন্য আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন কিন্তু (লক্ষ্য রাখবেন!) ইরাকে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা রাখে এমন ব্যক্তির নাম যেন প্রস্তাব করা হয়। লোকেরা হযরত উমর (রা.)-কে বলল, ইরাকের অধিবাসী এবং সেখানকার সেনাবাহিনী সম্পর্কে হুযূর নিজেই ভালো জানেন। আপনার কাছে তারা প্রতিনিধি দল হিসেবে আসা-যাওয়া করতো। আপনি তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করার এবং তাদের সাথে আলাপ করার সুযোগ পেয়েছেন। হযরত উমর (রা.)'র দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতা মহানবী (সা.)-এর একজন অন্যতম জ্যেষ্ঠ সাহাবী **হযরত নু'মান বিন মুকাররিন (রা.)**-কে এই গুরুদায়িত্বের জন্য বেছে নেয়। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত নু'মান (রা.) মসজিদে নামায পড়ছিলেন। তখন হযরত উমর (রা.) আসেন এবং তাঁকে (রা.) লক্ষ্য করে তাঁর পাশে গিয়ে বসেন। হযরত নু'মান (রা.)'র নামায শেষ হলে হযরত উমর (রা.) তাঁকে বলেন, আমি আপনাকে একটি পদে নিযুক্ত করতে চাই। একথা শুনে হযরত নু'মান (রা.) বলেন, সামরিক দায়িত্ব হলে আমি রাজি আছি কিন্তু কর আদায়ের কাজ হলে তা আমার পছন্দ নয়। হযরত উমর (রা.) বলেন, না; সামরিক দায়িত্ব। কিন্তু যে বিষয়টি বেশি সঠিক বা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় তাহলো, নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে হযরত নু'মান বিন মুকাররিন (রা.)-কে সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ সম্পর্কে তাবারীর বর্ণনা। তাহলো ইবনে ইসহাক বলেন, নাহাওয়ান্দের যুদ্ধ সম্পর্কে এটিও বর্ণিত হয়েছে, হযরত মুকাররিন বিন নু'মান (রা.) **কাসকারে** কর আদায়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে লিখেন, **"হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রা.) আমাকে কর আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত রেখেছেন অথচ আমার জিহাদ (যুদ্ধ) ভালো লাগে আর (আমি) যুদ্ধে অংশগ্রহণের বাসনা ও আকর্ষণ রাখি।"** এর পরিপ্রেক্ষিতে হযরত উমর (রা.) হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রা.)-কে এক পত্রে লিখেন, হযরত নু'মান (রা.) আমাকে জানিয়েছেন, আপনি তাঁকে (রা.) কর আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত রেখেছেন অথচ তাঁর (রা.) এ কাজ ভালো লাগে না বরং জিহাদ (যুদ্ধ) ভালো লাগে। তাই তাঁকে নাহাওয়ান্দের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রণক্ষেত্রে প্রেরণ করুন। মোটকথা, এই গুরুদায়িত্ব হযরত নু'মান বিন মুকাররিন (রা.)'র স্কন্ধে অর্পিত হয় এবং তিনি শত্রুর মোকাবিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সম্ভবতঃ হযরত উমর (রা.) যখন কূফায় ছিলেন তখন তিনি (রা.) এই পত্র লিখেছিলেন। এই পত্রটিও এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে, তিনি (রা.) মদীনাতে ছিলেন না বরং কূফায় ছিলেন; তখন তিনি (রা.) এই পত্র লিখেন। আর পত্রটি এভাবে আরম্ভ হয় যে,

"বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। নু'মান বিন মুকাররিন (রা.)'র প্রতি সালাম রইল। অতঃপর লিখেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা করছি যিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। আমি সংবাদ পেয়েছি, ইরানের একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী নেহাওন্দ শহরে তোমার সাথে যুদ্ধ করার

জন্য সমবেত হয়েছে। আমার পত্র পাওয়ার পর খোদা তা'লার নির্দেশ এবং তাঁর সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট হয়ে মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করো। কিন্তু তাদেরকে এমন শুষ্ক অঞ্চলে নিয়ে যেও না যেখানে হাঁটা দুস্কর হয়ে পড়ে। তাদের অধিকার প্রদানে ত্রুটি করবে না পাছে তারা অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। আর তাদেরকে চোরাবালিময় অঞ্চলেও নিয়ে যাবে না কেননা, আমার নিকট এক লক্ষ দিনারের চেয়েও একজন মুসলমানের জীবন অধিক প্রিয়। ওয়াস্‌সালামু আলাইকা।" এই আদেশ পালনের লক্ষ্যে হযরত নু'মান (রা.) শত্রুর মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে বের হন। তাঁর সঙ্গে কিছু বিশিষ্ট ও সাহসী মুসলমান ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ- **হুযায়ফাহ্ বিন ইয়ামান, ইবনে উমর, জারির বিন আব্দুল্লাহ্ বাজলী, মুগীরা বিন শু'বা, আমর বিন মাহদী কারেব, তুলায়হা বিন খুওয়াইলিদ আসদী এবং কায়েস বিন মাকশুহ্ মুরাদ**-ও ছিলেন। হযরত উমর (রা.) নির্দেশ দিয়েছিলেন, নু'মান বিন মুকাররিন যদি শহীদ হয়ে যান তবে আমীর হবেন হুযায়ফাহ্ বিন ইয়ামান। তার পরে হবেন জারির বিন আব্দুল্লাহ বাজলী। এরপর হযরত মুগীরা বিন শু'বা এবং তাঁর শাহাদতের ঘটনা ঘটলে আমীর হবেন, আশআস বিন কায়েস। আমর বিন মাহদী কারেব এবং তুলায়হা বিন খুওয়াইলিদ সম্পর্কে হযরত নু'মান (রা.)-কে হযরত উমর (রা.) লিখেন, আমর বিন মাহদী কারেব এবং তুলায়হা বিন খুওয়াইলিদ এরা দু'জন তোমার সাথে আছে। এরা দু'জন আরবের বিখ্যাত অশ্বারোহী, তাই তাদের কাছ থেকে যুদ্ধ সংক্রান্ত পরামর্শ নিতে থাকবে কিন্তু তাদেরকে কোন কাজে কর্মকর্তা নিযুক্ত করবে না। যাহোক, (এরপর) ইসলামী সৈন্যবাহিনী যাত্রা আরম্ভ করে। হযরত নু'মান (রা.) গোয়েন্দাদের মাধ্যমে খবর পেয়েছিলেন যে, নেহাওন্দ পর্যন্ত পথ পরিষ্কার, যেখানে শত্রু সেনাদল একত্রিত হয়েছিল। পূর্বেপ্রাপ্ত সংবাদ অনুসারে মনে হচ্ছিল, ব্যাপক শত্রু সমাগম ঘটছে। ইতিহাসবিদেরা সৈন্যসংখ্যা কোথাও ষাট হাজার আবার কোথাও এক লক্ষ লিখেছেন কিন্তু বুখারীর যে বর্ণনা রয়েছে সে অনুযায়ী এই সংখ্যা চল্লিশ হাজার ছিল অর্থাৎ পূর্বে ষাট হাজার কিংবা এক লক্ষের যে সংখ্যা বলা হয়েছে তা অতিরঞ্জিত। বুখারীর ভাষ্য অনুযায়ী শত্রুদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার। শত্রুরা আলোচনার বাসনা ব্যক্ত করে কাউকে পাঠাতে বলে। সে অনুযায়ী হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা.) যান। ইরানীরা অনেক জৌলুসপূর্ণ বৈঠকের আয়োজন করেছিল। ইরানের সেনাপতি তাজ বা মুকুট মাথায় দিয়ে স্বর্ণ-সিংহাসনে বসে ছিল। রাজদরবারিরা এমনসব অস্ত্রশস্ত্র সাজিয়ে বসে ছিল যা দেখে দৃষ্টি বিস্ফারিত হতো। অনুবাদক উপস্থিত ছিল। ইরানী সেনাপতি সেই পুরনো কাহিনীই পুনরাবৃত্তি করে। আরবদের জীবনের সমস্ত ঘৃণ্য দিক সে তুলে ধরে এবং বলে, আমি আমার চতুষ্পার্শ্বে উপবিষ্ট নেতাদের তোমাদেরকে মেরে ফেলার নির্দেশ এজন্য দিচ্ছি না যে, আমি চাই না তোমাদের নোংরা দেহের দ্বারা তাদের তির অপবিত্র হোক, নাউযুবিল্লাহ। তোমরা যদি এখনো ফেরত চলে যাও তবে আমরা তোমাদেরকে ছেড়ে দিবো অন্যথায় রণক্ষেত্রে কেবল তোমাদের লাশ আর লাশ দেখা যাবে। শত্রুদের এমন হাস্যস্কর হুমকি-ধামকিতে কী-ইবা আসে যায়! হযরত মুগীরা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে যে যুগ ছিল সে যুগ এখন আর নেই। তাঁর (সা.) আবির্ভাবের ফলে সম্পূর্ণ চিত্রই বদলে গেছে। যাহোক, দূতিয়ালি ব্যর্থ হয় আর উভয় সৈন্যবাহিনী রণক্ষেত্রে নামার জন্য প্রস্তুতি নেয়। ইসলামী বাহিনীর অগ্রে নু'আয়েম বিন মুকাররিন ছিলেন। (তাঁর) ডান ও বামের নেতৃত্বে ছিলেন হুযায়ফাহ্ বিন ইয়ামান এবং সুওয়ায়েদ বিন মুকাররিন। অশ্বারোহীর নেতা ছিলেন কা'কা বিন আমর। সামনের সারিতে অশ্বারোহীদের যে দল থাকে তাকে বলে **মুজাররেদা**। আর বাহিনীর পিছনের অংশের দায়িত্বে ছিলেন **মাজাশে'**। অতঃপর যুদ্ধ আরম্ভ হয় কিন্তু রণক্ষেত্রের পরিস্থিতি

মুসলমানদের জন্য ভীষণ কষ্টকর ছিল কেননা, শত্রুরা বিভিন্ন পরিখা, দুর্গ এবং ঘরবাড়ির কারণে সুরক্ষিত ছিল। পক্ষান্তরে মুসলমানরা ছিল খোলামাঠে। শত্রুরা অনুকূল পরিবেশ পেলেই আচমকা বাইরে এসে আক্রমণ করে বসতো এবং তারপর আবার নিরাপদ স্থানে ঢুকে পড়তো। শত্রুদের অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে এক সাহাবী বলেন, আমি তাদেরকে এমন একটি স্থান অতিক্রম করতে দেখেছি যে, আমার মনে হতো সেটি লোহার কোন পাহাড়। এ অবস্থা দেখে ইসলামী সেনাদলের সেনাপতি নু'মান বিন মুকাররিন (রা.) একটি পরামর্শ সভার আয়োজন করেন এবং এতে সেনাদের মাঝে অভীজ্ঞ ও বিচক্ষণ লোকদের ডাকেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, আপনারা লক্ষ্য করছেন যে, শত্রুরা কীভাবে তাদের দুর্গ, পরিখা এবং প্রাসাদগুলোর কারণে নিরাপদে বসে আছে। তাদের ইচ্ছে হলে বাইরে বের হয় আর মুসলমানরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারে না যতক্ষণ তারা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের না হয়। অপরদিকে শত্রুরা ক্রমাগতভাবে অতিরিক্ত সেনা সাহায্যও পাচ্ছে। তিনি বলেন, আপনারা দেখছেন যে, মুসলমানরা এমন পরিস্থিতিতে কেমন এক বিপাকে জর্জরিত। বিলম্ব না করে শত্রুদেরকে উন্মুক্ত ময়দানে এসে যুদ্ধ করতে বাধ্য করার জন্য কী পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। সেনাপতির একথা শুনে উক্ত সভার সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি **আমর বিন সাবী'** বলেন, শত্রুরা দুর্গে আবদ্ধ রয়েছে আর অবরোধ দীর্ঘ হচ্ছে। এ বিষয়টি ইসলামী সেনাবাহিনীর তুলনায় শত্রুদের জন্য বেশি কষ্টের এবং দুঃসহ। তাই, আপনি এভাবেই থাকতে দিন আর অবরোধ দীর্ঘায়িত করতে থাকুন। তবে হ্যাঁ তাদের মধ্য থেকে যারা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বাইরে বেরুবে তাদের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখুন। কিন্তু আমর বিন সাবী'র এই পরামর্শকে সভা গ্রহণ করে নি। এরপর **আমর বিন মাদী কারেব** বলেন, ভয় পাওয়ার কিছু নেই সর্বশক্তি প্রয়োগে এগিয়ে গিয়ে শত্রুর ওপর আক্রমন করে দেয়া উচিত কিন্তু এ প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করা হয়। অভীজ্ঞরা যে আপত্তি করেছে তাহলো, সামনে এগিয়ে আক্রমণ করলে আমাদের মোকাবিলা মানুষের সাথে নয় বরং প্রাচিরের সাথে হবে অর্থাৎ এসব প্রাচির আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের সাহায্য করছে। অর্থাৎ, শত্রুরা প্রকাশ্যভাবে সামনে না থেকে দুর্গের ভেতরে বসে আছে। এরপর তুলায়হা (রা.) দাঁড়িয়ে বলেন, আমার মতে এই উভয় ব্যক্তির পরামর্শই সঠিক নয়। আমার মত হলো, একটি ক্ষুদ্র অশ্বারোহী দল শত্রু অভিমুখে পাঠানো হোক, যারা নিকটে গিয়ে কিছু তির বর্ষণ করে যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে বা (শত্রুদের) উত্তেজিত করবে। এই দলের মোকাবিলায় শত্রুরা বাইরে বের হবে এবং আমাদের ক্ষুদ্র দলটির সাথে যুদ্ধ করবে। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের দলটি পিছু হটতে থাকবে এবং এমন ভাব দেখাবে যেন তারা পরাজিত হয়ে পলায়ন করছে। আশা করা যায়, শত্রুরা বিজয়ের আশায় বাইরে বেরিয়ে আসবে আর এরপর যখন তারা উন্মুক্ত প্রান্তরে চলে আসবে তখন আমরা তাদের সাথে সঠিকভাবে বোঝাপড়া করবো। হযরত নু'মান (রা.) এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং তাকে হযরত কা'কা'র হাতে তুলে দিয়ে বলেন, এই প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা হোক। তিনি তুলায়হার প্রস্তাবানুসারে আমল করেন এবং তুলায়হা যেভাবে বলেছিল হুবহু ঠিক তেমনই হয়েছে। কা'কা' (আপাতদৃষ্টিতে) পরাজিত হয়ে ধীরে ধীরে পিছু হটতে থাকেন আর শত্রু সৈন্যদল বিজয়ের নেশায় সামনে এগুতে থাকে এমনকি সবাই নিজেদের দুর্গ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। কেবলমাত্র দরজায় নিযুক্ত পাহারাদার সৈন্য নিজ নিজ নিরাপদ জায়গায় ভেতরে রয়ে যায়। শত্রুপক্ষের সৈন্যবাহিনী নিজেদের নিরাপদ স্থান থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে সম্মুখে অগ্রসর হতে হতে মূল ইসলামী সৈন্যবাহিনীর এতটাই নিকটে চলে আসে যে, শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তিরে কয়েকজন মুসলমান আহতও হয়। কিন্তু তখনও হযরত নু'মান (রা.) যুদ্ধের সাধারণ ঘোষণা প্রদান করেন

নি। হযরত নু'মান (রা.) রসূল প্রেমীক ছিলেন আর মহানবী (সা.)-এর সাধারণ রীতি ছিল, সকালে যদি যুদ্ধ শুরু না হতো তাহলে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যুদ্ধের ব্যবস্থা করতেন। তখন গরমের তীব্রতা থাকতো না বরং ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত হতে থাকতো। কতিপয় মুসলমান যুদ্ধ করার জন্য অস্থির হয়ে গিয়েছিলেন আর শত্রুর তিরের আঘাতে কিছু মুসলমান আহত হওয়ার কারণে এই উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা সেনাপ্রধানের কাছে গিয়ে অনুমতি চাইলে তিনি বলতেন, সামান্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। অর্থাৎ কমান্ডার তাদেরকে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলেন। হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা.) অস্থির হয়ে বলেন, আমি হলে তো এতক্ষণে যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে দিতাম। নু'মান (রা.) উত্তরে বলেন, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। একথা ঠিক আপনি যখন আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেন তখন ব্যবস্থাপনা সুন্দরভাবে পরিচালনা করতেন কিন্তু আজও আল্লাহ্ আমাদেরকে ও আপনাকে অপদস্ত করবেন না। আপনি যে জিনিষটি চটজলদি অর্জন করতে চান আমি সেটি ধৈর্যের মাধ্যমে অর্জন করার আশা করি।

সূর্য যখন ঢলতে যাচ্ছিল তখন হযরত নু'মান (রা.) ঘোড়ায় আরোহণ করেন এবং চতুর্দিকে সৈন্যদের পর্যবেক্ষণ করেন। প্রতিটি পতাকার কাছে গিয়ে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ বক্তৃতা করেন এবং বেদনাভরা কণ্ঠে নিজের শাহাদতের জন্য দোয়া করেন যা শুনে লোকেরা কাঁদতে থাকে। এই ঘোষণার পর তিনি (রা.) বলেন, আমি তিনবার তকবীর বলবো এবং একইসাথে পতাকা নাড়বো। প্রথমবার তকবীর বলার পর সবাই সোচ্চার হয়ে যাবে, দ্বিতীয়বার তকবীর বলার পর সবাই অস্ত্র তুলে নিবে অর্থাৎ অস্ত্র প্রস্তুত রাখবে এবং শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে যাবে আর তৃতীয়বার তকবীর বলা ও পতাকা নাড়ানোর সাথে সাথেই আমি শত্রুসারিতে ঝাঁপ দেবো। আর তোমরা প্রত্যেকে নিজের প্রতিপক্ষ সারির ওপর আক্রমণ করবে। এরপর তিনি দোয়া করেন, **"হে আল্লাহ্! তুমি তোমার ধর্মকে সম্মানিত করো, তোমার বান্দাদের সাহায্য করো এবং এর প্রতিদানস্বরূপ নু'মানকে প্রথম শহীদ হবার সৌভাগ্য দান কর"**। অর্থাৎ সেনাপতি এই দোয়া করেন। হযরত নু'মান (রা.) তৃতীয় তকবীর উচ্চারণ করার সাথে সাথে মুসলমানরা শত্রুসারির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের আবেগ ও উদ্দীপনার যে অবস্থা ছিল তাহলো, কোন একজন সম্পর্কেও এই ধারণা করা যেতে পারে না যে, তারা শহীদ হওয়া কিংবা বিজয় অর্জন করা ছাড়া অন্য কিছু কল্পনাও করতো। নু'মান (রা.) এত তীব্রবেগে শত্রুদের ওপর আক্রমণ করেন যে, যারা তা দেখছিল তাদের মনে হচ্ছিল এটি পতাকা নয় যেন কোন ঈগল ছোঁ মারছে। সর্বোপরি মুসলমানরা একজোট হয়ে তরবারি দিয়ে আক্রমণ করে কিন্তু এর বিপরীতে শত্রুসারিও অনঢ়-অটল ছিল। লোহার সাথে লোহার সংঘর্ষে প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছিল। মাটিতে রক্ত গড়িয়ে পড়ার কারণে মুসলমান অশ্বারোহীদের পা পিছলে যাচ্ছিল। হযরত নু'মান (রা.) যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন, তাঁর ঘোড়াও পিছলে যায় এবং তিনি মাটিতে পড়ে যান। সাদা রঙের পাগড়ী বা টুপি পড়ার কারণে তাকে স্পষ্ট চেনা যাচ্ছিল। তাঁর ভাই নু'আয়েম বিন মুকাররিন যখন তাঁকে পড়ে যেতে দেখেন তখন পরম বিচক্ষণতার সাথে পতাকা পড়ে যাওয়ার পূর্বে সেটিকে তুলে নেন এবং হযরত নু'মান (রা.)-কে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেন। তারপর পতাকা নিয়ে হুযায়ফাহ্ বিন ইয়ামান-এর নিকট যান কেননা তিনি হযরত নু'মান (রা.)'র স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। হযরত হুযায়ফাহ্ (রা.) নু'আয়েম-কে নিয়ে সেস্থানে পৌঁছেন যেখানে হযরত নু'মান (রা.) ছিলেন এবং সেখানে পতাকা উড্ডীন করা হয়। হযরত মুগীরা (রা.)'র পরামর্শ অনুযায়ী যুদ্ধের ফলাফল সামনে না আসা পর্যন্ত হযরত নু'মান (রা.)'র মৃত্যুর সংবাদ গোপন রাখা হয়। **আখবারুত্ তিওয়ালে** লেখা আছে, হযরত নু'মান বিন

মুকাররিন (রা.) যখন আহত হয়ে পড়ে যান তখন তাঁর ভাই তাঁকে তাঁবুর ভেতরে নিয়ে যান এবং তিনি তার পোশাক নিজে পরিধান করেন আর তাঁর তরবারি নিয়ে তাঁরই ঘোড়ায় আরোহণ করেন। যে কারণে অধিকাংশ মানুষ এটিই মনে করছিল যে, ইনিই হযরত নু'মান (রা.)।

ইতিহাসবিদ তাবারি লিখেন, চরম স্পর্শকাতর মুহূর্তে আমীরের নির্দেশ মান্য করার উন্নত দৃষ্টান্ত এটি। হযরত নু'মান (রা.) ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলেন, যদি নু'মানও মারা যায় কেউ যেন যুদ্ধ বাদ দিয়ে তাঁর প্রতি মনোযোগ না দেয় বরং শত্রুর মোকাবিলা অব্যাহত রাখে। মা'কেল বলেন, হযরত নু'মান (রা.) যখন মাটিতে পড়ে যান আমি তাঁর কাছে আসি। তৎক্ষণাৎ তাঁর নির্দেশ আমার মনে পড়ে এবং আমি ফেরত চলে যাই এবং যুদ্ধ করতে থাকি। যাহোক, সারাদিন ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয় আর রাত আসতেই শত্রু পিছপা হয়। রণক্ষেত্র মুসলমানদের অনুকূলে এসে যায় এবং ইরানীদের বড় বড় নেতা মারা যায়। মা'কেল বলেন, বিজয়ের পর আমি হযরত নু'মান (রা.)'র কাছে আসি। তখনও তার প্রাণ ছিল, মৃদুশ্বাস নিচ্ছিলেন। আমি তাঁর চেহারা আমার মশকের পানি দিয়ে ধৌত করি। তিনি আমার নাম জিজ্ঞেস করেন। অতঃপর মুসলমানদের কী অবস্থা তা জানতে চান? আমি বলি, খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আপনাকে বিজয় ও সাহায্যের সুসংবাদ জানাচ্ছি। তিনি (রা.) বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্, হযরত উমর (রা.)-কে সংবাদ পাঠিয়ে দাও। হযরত উমর (রা.) যুদ্ধের ফলাফল জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ছিলেন। যে রাতে যুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা ছিল সেই রাতটি হযরত উমর (রা.) অত্যন্ত ব্যাকুলতার সাথে বিনিদ্র কাটিয়ে দেন।

বর্ণনাকারী বলছেন, এতটা অস্থিরতার সাথে তিনি (রা.) দোয়ায় মগ্ন ছিলেন যে, মনে হচ্ছিল যেন কোন নারী প্রসব বেদনায় ক্লিষ্ট। দূত বিজয়ের সংবাদ নিয়ে মদীনায় পৌঁছেন। হযরত উমর (রা.) আলহামদুলিল্লাহ্ বলেন এবং নু'মান (রা.)'র কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। দূত তাঁর (অর্থাৎ নু'মানের) শাহাদতের সংবাদ দেন। তখন হযরত উমর (রা.) অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে মাথায় হাত রেখে কাঁদতে থাকেন। এরপর দূত অন্যান্য শহীদের নাম শোনান এবং বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আরো অনেক মুসলমান শহীদ হয়েছেন যাদের আপনি চিনেন না। হযরত উমর (রা.) কাঁদতে কাঁদতে বলেন, উমর তাদেরকে চিনে না তাতে তাদের কোন ক্ষতি নেই, আল্লাহ্ তো তাদেরকে চিনেন। যদিও তারা মুসলমানদের মাঝে পরিচিত নন কিন্তু আল্লাহ্ তাদের শাহাদাতের মাধ্যমে সম্মানীত করেছেন। আল্লাহ্ তাদের জানেন; তাই তাদেরকে উমরের চেনা না চেনায় কি যায় আসে? যুদ্ধের পর মুসলমানরা **হামাদান** পর্যন্ত শত্রুদের পিছু ধাওয়া করে। এটি দেখে ইরানী নেতা **খসরু শানুম** হামাদান ও রুস্তগী শহরের পক্ষ থেকে এই শর্তে সন্ধি করে নেয় যে, এই শহরগুলো থেকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করা হবে না। মুসলমান বাহিনী নাহাওয়ান্দ শহর দখল করে নেয়। নাহাওয়ান্দের বিজয় ফলাফলের দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরত্ববহ ছিল। এরপর ইরানীদের একসাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করার সুযোগ হয়নি। আর মুসলমানরা এই বিজয়কে **ফাতহুল ফুতুহ** নামে অভিহিত করতে আরম্ভ করে।

ইরানে গণ সামরিক অভিযানের প্রস্তাব কীভাবে সামনে এলো? লিখা আছে, যদিও নৈতিক ও আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে ইরানের আগ্রাসী শক্তি সম্পূর্ণরূপে চূর্ণবিচূর্ণ করার মুসলমানদের পুরো অধিকার ছিল। কেননা শত্রুরা বার বার আক্রমণ করছিল। হযরত উমর (রা.)'র কোমল হৃদয় সকল ক্ষেত্রে রক্তপাত ঘটানোকে ঘৃণা করতো। হযরত উমর (রা.) এটি অপছন্দ করতেন। আর রহমাতুল্লিল আলামীন মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান সেবকের মনের একান্ত ইচ্ছা ছিল, পারস্য

সাম্রাজ্য সীমান্তবর্তী এলাকায় পরাজিত হয়ে অতিরিক্ত সামরিক কার্যক্রম যেন বন্ধ করে দেয় এবং এই ধারাবাহিক যুদ্ধ-বিগ্রহের যেন অবসান ঘটে। হযরত উমর (রা.) এই ইচ্ছা শুধুমাত্র বার বার প্রকাশই করেন নি বরং ইরান ও ইরাকের সৈন্যদের নিজেদের পক্ষ থেকে কোন সামরিক কার্যক্রম পরিচালনায় কঠোরভাবে বারণ করেছিলেন। কিন্তু শত্রুদের আগ্রাসী সামরিক কার্যক্রম এবং বিজিত অঞ্চলে বার বার বিদ্রোহের কারণে তাঁর এই ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। আর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আগত বিচক্ষণ পরামর্শদাতাদের এক প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আরও যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করা ছাড়া কোন উপায় নেই। এটি ১৭ হিজরী সনের ঘটনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি সৈন্যদের সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি দেননি; যেমনটি পূর্বেও বলা হয়েছে। কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতি– আর ধৈর্য ধারণের অনুমতি দিচ্ছিল না। হযরত উমর (রা.) দেখে নিয়েছিলেন, ইয়াযদাজরদ প্রতিবছর অনবরত সৈন্য প্রেরণ করে যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করছিল। মানুষ বার বার তাঁর (রা.) সমীপে নিবেদন করছিলেন যে, যতদিন ইয়াযদাজরদ সিংহাসনে থাকবে, তার আচরণ পরিবর্তন হবে না। নাহাওন্দের যুদ্ধ এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আরো দৃঢ়তা দিয়েছিল। এহেন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে হযরত উমর (রা.) একুশ হিজরীর নাহাওন্দের যুদ্ধের পর সেনাবাহিনীকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন, আর সমগ্র ইরান জয়ের পরিকল্পনা করে কূফা অভিমুখে প্রেরণ করেন যা এই যুদ্ধ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সেনা ছাউনির মর্যাদা রাখত। হযরত উমর (রা.) ইরানের বিভিন্ন এলাকার জন্য পৃথক পৃথক সেনাপতি নিযুক্ত করেন। আর মদীনা থেকে স্বয়ং পতাকা বানিয়ে তাদের জন্য প্রেরণ করেন। **খুরাসানের পতাকা আহনাফ বিন কায়েসকে, ইস্তাখলাবের পতাকা উসমান বিন আবু আসকে, আরদশির এবং সাবুরের পতাকা মুজাশে' বিন মাসউদকে, ফাসাহ্ এবং দার বাযিরদকাসের পতাকা সারিয়া বিন যুনায়েমকে, সাজিস্তানের পতাকা আসেম বিন আমরকে, মাকরানের পতাকা হাকেম বিন আমরকে** প্রেরণ করেন। আর কারমানের পতাকা সুহায়েল বিন আদীকে প্রদান করেন।

আযারবাইজানের বিজয়ের জন্য উতবাহ্ বিন ফারকাদ এবং বুকাইর বিন আবদুল্লাহ্কে পতাকা প্রেরণ করেন আর ডানের আক্রমন আযারবাইজানে হুলওয়ানের দিক থেকে আর অন্যজন বাম দিক থেকে, অর্থাৎ মসূলের দিক থেকে আক্রমণ করবে। ইস্ফাহান অভিযানের পতাকা আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্র হাতে ন্যস্ত হয়।

ইস্ফাহান বিজয় সম্পর্কে লিখা আছে, ইস্ফাহান অভিযানের দায়িত্বভার আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্র ওপর অর্পিত হয়। তিনি নাহাওন্দে ছিলেন। এ অবস্থায় তিনি হযরত উমর (রা.)'র ইস্ফাহানের উদ্দেশ্যে যাত্রার নির্দেশ সম্বলিত পত্র পান। (যাতে এ নির্দেশও ছিল যে) অগ্রসেনার কমান্ডার বানাবে আব্দুল্লাহ্ বিন ওরকা রিয়াহিকে। এছাড়া দুই পাশের দুই দলের নেতৃত্ব আব্দুল্লাহ্ বিন ওরকা আসদীকে এবং ইসমা বিন আব্দুল্লাহ্কে অপর্ণ করবে। আব্দুল্লাহ্ যাত্রা করেন এবং শহরতলিতে ইস্ফাহানবাসীর এক সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ হয় আর তারা ইরানী সেনাপতি **উস্তান্দারের** নেতৃত্বে যুদ্ধ করছিল। শত্রুদের অগ্রসেনার নেতা ছিল অভীজ্ঞ বৃদ্ধ **শাহর বিন বারায জাযভিয়া**। সে তার বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আর তুমুল যুদ্ধ হয়। জাযভিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানালে আব্দুল্লাহ্ বিন ওরকা তার ভবলীলা সাঙ্গ করেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর শত্রুরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায় আর সেনাপতি উস্তান্দার আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্র সাথে সন্ধি করে। ইসলামী বাহিনী ইস্ফাহানের কেন্দ্র অভিমুখে অগ্রসর হয়, এটি **জ্যায়** নামে প্রসিদ্ধ ছিল আর তারা শহর ঘিরে ফেলে। একদিন শহরের শাসক **ফাযুস্ফান** বেরিয়ে এসে ইসলামী বাহিনীর আমীর

আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্‌কে বলে, আমাদের উভয় বাহিনীর যুদ্ধ অপেক্ষা আমার এবং তোমার যুদ্ধ করাই উত্তম হবে। এরপর যে তার প্রতিপক্ষের ওপর জয়যুক্ত হবে তাকেই (ও তার বাহিনীকে) বিজয়ী আখ্যা দেয়া হবে। আব্দুল্লাহ্ এ প্রস্তাব মেনে নেন এবং বলেন, প্রথমে তুমি আক্রমণ করবে না আমি করব? **ফাযুস্ফান** প্রথমে আক্রমণ করে কিন্তু আব্দুল্লাহ্ অবিচল ও অটল থাকেন আর শত্রুর আঘাতে শুধু তার ঘোড়ার জিন বা গদি কেটে যায়। আব্দুল্লাহ্ ঘোড়ার খালি পিঠেই শক্ত হয়ে বসেন এবং আঘাত হানার পূর্বে তাকে সম্বোধন করে বলেন, অবিচল থেক। তখন **ফাযুস্ফান** বলে, আপনি বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও সাহসী একজন মানুষ, আমি আপনার সাথে সন্ধি করে আপনার হাতে শহর তুলে দিতে প্রস্তুত আছি। অতএব, সন্ধি হয়ে যায় আর মুসলমানরা শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। তাবারীর ইতিহাস থেকে জানা যায়, এ বিজয় ২১ হিজরী সনে অর্জিত হ।

ঐতিহাসিক **বালাযুরী** এ যুদ্ধে অংশ নেয়া ইসলামী বাহিনীর আমীর হিসেবে আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্‌র পরিবর্তে **আব্দুল্লাহ্ বিন বুদায়েল বিন ওরকা খুযায়ীর** নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক তাবারী লিখেছেন, কিছু লোক আব্দুল্লাহ্ বিন ওরকা আস্‌দী যিনি এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এক দিকের সেনাদলের নেতৃত্বেও ছিলেন তাকে আব্দুল্লাহ্ বিন বুদায়েলের সাথে গুলিয়ে ফেলেছে। অথচ আব্দুল্লাহ্ বিন বুদায়েল হযরত উমর (রা.)'র যুগে অল্প বয়স্ক ছিলেন এবং সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে যখন তিনি নিহত হন তখন তার বয়স ছিল মাত্র ২৪ বছর।

হামাযানের বিদ্রোহ এবং পুনঃবিজয়। নাহাওন্দের পর মুসলমানরা হামাযানও জয় করে নিয়েছিল কিন্তু হামাযানবাসী সন্ধির চুক্তি ভঙ্গ করে এবং আযারবাইজানের কাছ থেকে সৈন্য সহায়তা নিয়ে সেনাবাহিনী গঠন করে। হযরত উমর (রা.) নু'য়ায়েম বিন মুকার্‌রিনকে বারো হাজার সৈন্যের সাথে সেখানে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তুমুল যুদ্ধের পর মুসলমানরা শহর জয় করে নেয়। হযরত উমর (রা.) এ যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত ছিলেন। বিজয়ের সংবাদ নিয়ে দূত এলে হযরত উমর (রা.) তার মাধ্যমেই নু'য়ায়েম বিন মুকার্‌রিনকে নির্দেশ দেন, হামাযানে কাউকে আপনার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে আপনি নিজে **রায়** অভিমুখে অগ্রসর হোন এবং সেখানে যে শত্রু-সেনাদল রয়েছে সেটিকে পরাজিত করে রায়'তেই অবস্থান করুন। কেননা, অত্রাঞ্চলে এ শহরটিই কেন্দ্রের মর্যাদা রাখে। যাহোক, এই আলোচনা এবং অন্যান্য যুদ্ধের আলোচনা (এখনও) বাকি রয়েছে, হযরত উমর (রা.)'র যুগে যেসব বিজয় অর্জিত হয়েছিল সেগুলোর আলোচনা চলছে। ইনশাআল্লাহ্ আগামীতেও এ আলোচনা অব্যাহত থাকবে।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াতের স্মৃতিচারণও করব এবং জুমুআর নামাযের পর তাদের (গায়েবানা) জানাযাও পড়াব। তাদের মাঝে প্রথম হলেন, ইন্দোনেশিয়ার মুহাম্মদ দিয়ানতুনূ সাহেব, যিনি গত ১৫ জুলাই ৪৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার স্ত্রী লিখেন, মরহুম একটি অ–আহমদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু শৈশব থেকেই তার মসজিদে যাওয়ার গভীর আগ্রহ ছিল আর অন্য ছেলেমেয়েদের তুলনায় তিনি ভিন্ন ধরণের ছিলেন। দীর্ঘসময় মসজিদে কাটানো, ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন এবং আল্লাহ্ তা'লার যিক্‌র করা তিনি পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, এ সবই ছিল তার জন্য প্রকৃত নিয়ামত আর এর উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জন করা। গ্রামে তার একজন আহমদী বন্ধু ছিলেন। উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ালেখার সময় তার সেই বন্ধুর মাধ্যমে তিনি আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে জানতে পারেন। মরহুম চীলীদূ ও চীরগুন (জামা'তে) বয়আত করেন। তার বয়আত করার সংবাদ শুনতেই তার পিতা অত্যন্ত

রাগান্বিত হন এবং তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। কেননা, তিনি মনে করতেন তার ছেলে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। বাড়ির দরজাও তার জন্য খোলা হতো না। বাড়ির বাইরেই তাকে ঘুমাতে হতো। কিছুদিন এভাবেই চলতে থাকে। এরপর তাকে ক্ষমা করে দেয়া হলে তিনি বাড়িতে যাতায়াত শুরু করেন। ১৯৯৭ সালে স্থানীয় জামা'তের কর্মকর্তারা তাকে জামেয়াতে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেন, কেননা তাদের মতে তিনি মুবাল্লিগ হওয়ার যোগ্য ছিলেন। যৌবনকাল থেকেই তার তবলীগ করার আগ্রহ ছিল। যাহোক, তিনি জামেয়াতে ভর্তি হয়ে ২০০২ সনে জামেয়া থেকে পাশ করে বের হন। তার প্রথম নিযুক্তি হয় জেনিপুন্তুয়া জামা'তে। তবলীগ করার প্রতি তার যেহেতু গভীর আগ্রহ ছিল, তাই তিনি দাঈআনে ইলাল্লাহ্‌দের সাথে বিভিন্ন গ্রামে যেতেন। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে তিনি একটি গ্রামের শত শত লোককে বয়'আত করানোরও সৌভাগ্য লাভ করেন। মিশন হাউজের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হলে তিনি নিজেও কাজে অংশ নিতেন। সেখানে তখন জামা'তের কোন মিশন হাউজ ছিল না। তার স্ত্রী বলেন, আমার মনে আছে আমরা খুবই সাদামাটা একটি ভাড়া বাসায় থাকতাম আর তা এতটাই অনাড়ম্বর ছিল যে, সেই ঘরে তেমন কোন আসবাবপত্রও ছিল না। আসবাব বলতে সর্বসাকুল্যে একটি কম্বল, একটি বালিশ এবং একটি চাঁটাই ছিল যার ওপর শুয়ে আমরা ঘুমাতাম। খাবার রান্নার জন্য যে হাড়িপাতিল ছিল তাতেই সব কাজ করতাম, অর্থাৎ তাতেই খাবার রান্না করতাম আর তাতেই পানি ইত্যাদি রাখতাম। তিনি বলেন, একদিন মুবাল্লিগ ইনচার্জ সুইয়ুতি আযীয সাহেব এবং প্রাদেশিক মুবাল্লিগ সাইফুল লাইয়ুন সাহেব আমাদের বাড়ি আসেন। আমাদের ঘরের অবস্থা দেখে তারা দু'জনই হতবাক হয়ে যান। যাহোক, এরপর জেনিপন্তুয়া কেন্দ্রের কাছে মিশন হাউজ নির্মাণের জন্য আবেদন করলে সেখানে মিশন হাউজও নির্মিত হয় আর এরপর সেখানে মসজিদও নির্মিত হয়। শুরুতে সেখানে তারা অ–আহমদী মুসলমানদের একটি যৌথ মসজিদে নামায পড়ত কিন্তু বিরোধিতার কারণে সেখানে (আহমদীদের) নামায পড়া বন্ধ হয়ে যায় আর এরপর তারা একটি বাড়িতে নামায পড়ত। মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রেও অনেক প্রতিবন্ধকতা ছিল। মিস্ত্রিরা কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায় আর গ্রাম্য সর্দারও '(মসজিদ) নির্মাণ হতে দিব না' বলে হুমকী দেয়। যাহোক, এসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তিনি সাহস হারান নি এবং অত্যন্ত দৃঢ়চিত্তে মসজিদের নির্মাণ কাজ অব্যাহত রাখেন। শ্রমিকরা না এলে খোদ্দাম ও আতফাল দিয়ে ওয়াকারে আমল করাতেন, বরং যেসব অ–আহমদী ছেলেপেলের সাথে সুসম্পর্ক ছিল তারাও (এ কাজে) অংশ নিত আর এভাবেই মসজিদ নির্মাণ হয়ে যায়। তার স্ত্রী বলেন, যখন তার পদায়ন জাকার্তায় হয় তখন সেখানেও চরম বিরোধিতা ছিল। কিন্তু সেখানে বন্যা এলে সেই বিরুদ্ধবাদি অ–আহমদীরাই আশ্রয়ের জন্য আমাদের মসজিদে আসে এবং টানা দু'বছর বন্যা হয় আর তারা আমাদের মসজিদেই আশ্রয় নেয়। অর্থাৎ একদিকে তারা বিরোধিতা করে আর অপরদিকে আশ্রয়ও নিতে আসে। এর ফলে বিরোধিতায় কিছুটা ভাটা পড়ে। তার উল্লেখযোগ্য অবদানগুলোর মাঝে একটি হলো, ইন্দোনেশিয়ায় তিনি রেডিও ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে জামা'তের বার্তা এবং যুগ খলীফার খুতবাগুলোর অনুবাদ সরাসরি প্রচারের ব্যবস্থা করিয়েছেন। তখনও এখানে ইউটিউবের মাধ্যমে খুতবার সরাসরি অনুবাদ প্রচার করা আরম্ভ হয় নি। যাহোক, সারা জীবনই তিনি কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং জামা'তের একজন আদর্শ মুবাল্লিগ ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি স্ত্রী ছাড়াও পাঁচ সন্তান রেখে গিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার সন্তানসন্ততিকেও তার পুণ্যকর্মগুলো অব্যাহত রাখার তৌফিক দিন।

দ্বিতীয় জানাযাটি হলো, আমেরিকার শিকাগো নিবাসী সাহেবযাদা ফারহান লতিফ সাহেবের। কিছুদিন পূর্বে তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতিফ শহীদ সাহেবের প্রপৌত্র ছিলেন। মরহুম শিকাগো জামা'তের একজন কর্মঠ সদস্য ছিলেন। সর্বদা সাহায্য-সহযোগিতা ও সেবার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। হাস্যজ্জল মুখ এবং সবার আগে সালাম দেয়াটা ছিল তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। মসজিদের ছোটবড় যে কোন কাজে তাৎক্ষণিকভাবে লাব্বায়েক বলে অংশ নিতেন আর সেবার জন্য সর্বদা প্রথম সারিতে থাকতেন। শিকাগো জামা'তে অডিটরের দায়িত্ব তিনি সুচারুরূপে পালন করেন। মরহুম মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি ৩জন ছোট ছোট সন্তান এবং বৃদ্ধ পিতামাতা রেখে গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৪৫ বছর। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন আর (তার) সন্তানদেরকেও সর্বদা জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ লাহোর নিবাসী মালেক মুবাশ্বের আহমদ সাহেবের, যিনি ২১ নভেম্বর (২০২০ সনে) ইন্তেকাল করেন। অনেক দিন পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন, কিন্তু তার জানাযা পড়া হয় নি। তার ছেলে তার জানাযা পড়ানোর (আবেদন জানিয়ে) লিখেছিলেন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী এবং প্রখ্যাত মুফাস্সিরে কুরআন হযরত মওলানা গোলাম ফরীদ সাহেব (রা.)'র পুত্র ছিলেন। মিয়াঁওয়ালী জেলার দাউদ খেল জামা'তের আমীরের দায়িত্ব ছাড়াও তিনি হায়দ্রাবাদ জামা'তের বিভিন্ন পদে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। পবিত্র কুরআনের অভিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রেও তিনি কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর নির্দেশে তার পিতা মালেক গোলাম ফরীদ সাহেবের মৃত্যুর পর তিনি তার ছোট ভাইয়ের সাথে সম্মিলিতভাবে এটি বিন্যস্ত করেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন।

যেমনটি আমি বলেছি, জুমুআর নামাযের পর এদের সবার (গায়েবানা) জানাযার নামায পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)